বাংলা সংখ্যাবাচক শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

বাংলা সংখ্যাবাচক শব্দের কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে–

১. দশভিত্তিক গঠন: বাংলা সংখ্যাব্যবস্থা মূলত দশভিত্তিক। এক থেকে দশ, তারপর দশের সঙ্গে একক যোগের ঐতিহাসিক গঠন দেখা যায়।

১০= দশ; ২০= বিশ; ২১= একুশ; ২২= বাইশ; ৩০= ত্রিশ/তিরিশ; ৪০= চল্লিশ; ৫০= পঞ্চাশ।

২. সংস্কৃত, প্রাকৃত ও তদ্ভব প্রভাব: বাংলা সংখ্যার বহু রূপ সংস্কৃত ও প্রাকৃত ধারার মাধ্যমে গঠিত। যেমন– দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম– এসব পূরণবাচকরূপে সংস্কৃত প্রভাব স্পষ্ট। আবার এক, দুই, তিন, চার– এসব কথ্য পরিমাণবাচকরূপে তদ্ভব বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

৩. কথ্য ও লিখিত রূপের ভিন্নতা

লিখিত	কথ্য/প্রচলিত	লিখিত	কথ্য/প্রচলিত
ত্রিশ	তিরিশ	একত্রিংশ	একত্রিশতম
চতুর্দশ	চৌদ্দতম/চতুর্দশ	অর্ধ	আধা

বাংলায় সংখ্যার লিখিত ও কথ্য রূপে পার্থক্য থাকতে পারে।

৪. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবহার: তারিখবাচক শব্দ ব্যাকরণের নিয়ম নয়; সামাজিক স্মৃতি ও উৎসবের ভাষাও। যেমন– একুশে, পহেলা, বাইশে– এসব শব্দ মানুষের আবেগের সঙ্গে যুক্ত।

বাংলা সংখ্যাবাচক শব্দের ঐতিহাসিক উৎস

বাংলা ভাষা ইন্দো-আর্য ভাষাপরিবারের অন্তর্ভুক্ত। Banglapeadia-তে বাংলা ভাষার ইতিহাস সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, বাংলা ৯০০–১০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মাগধী অপভ্রংশ ও অবহট্‌ঠের ধারা থেকে নতুন ইন্দো-আর্য ভাষা হিসেবে গড়ে ওঠে।

ফলে বাংলা সংখ্যাবাচক শব্দের বড়ো অংশের উৎস প্রাচীন ইন্দো-আর্য বা সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশধারায় খুঁজে পাওয়া যায়। তবে এখানে একটি সতর্কতা জরুরি। বাংলা সংখ্যাবাচক শব্দ সরাসরি সংস্কৃত থেকে অপরিবর্তিতভাবে আসেনি। বহু শব্দ সংস্কৃত → পাকত → অপভ্রংশ/অবহট্‌ঠ → পাচীন বাংলা → আধুনিক বাংলা– এই দীঘ ধ্বনিগত ও রূপগত পরিবতনের মধ্য দিয়ে এসেছে।

ঐতিহাসিক ধারা

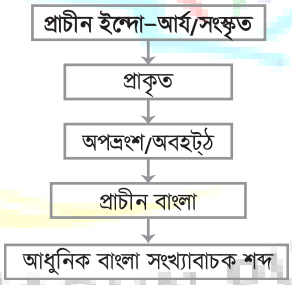

NABARUN PUBLICATION

উদাহরণধর্মী ধারা

আধুনিক বাংলা	প্রাচীন / সংস্কৃত উৎসধারা	মন্তব্য
এক	এক / একঃ / eka	মূল একক সংখ্যা
দুই	দ্বি / dvi	ধ্বনি পরিবর্তনে দুই
তিন	ত্রি / tri	প্রাকৃত-অপভ্রংশে সরলীকরণ
চার	চতুর্ / catur	ধ্বনিগত পরিবর্তনে চার
পাঁচ	পঞ্চ / pañca	পঞ্চ ⟶ পাঁচ
ছয়	ষট্ / ṣaṭ	ধ্বনিগত পরিবর্তনে ছয়
সাত	সপ্ত / sapta	ব্যঞ্জনগুচ্ছ সরল হয়ে সাত
আট	অষ্ট / aṣṭa	অষ্ট ⟶ আট
নয়	নব / nava	নব ⟶ নয়
দশ	দশ / daśa	তুলনামূলকভাবে স্পষ্ট উৎস
বিশ	বিংশতি/ viṃśati	বিংশতি ⟶ বিশ
শত / শ	শত / śata	শত, একশ
লক্ষ	লক্ষ / lakṣa	সংস্কৃত উৎসধারা
কোটি	কোটি / koṭi	প্রাচীন ভারতীয় উৎসধারা
সহস্র	সহস্র / sahasra	সংস্কৃতধর্মী রূপ

সংখ্যাবাচক শব্দের উৎপত্তি

উৎপত্তির সামগ্রিক ফ্লোচার্ট

বাস্তব জীবন

- মানুষ, পশু, খাদ্য, বস্তু গণনার প্রয়োজন
- প্রাথমিক সংখ্যা-ধারণা
  - এক
  - দুই
  - অনেক
- শরীরভিত্তিক গণনা
  - আঙুল → ৫
  - দুই হাত → ১০
  - হাত-পা → ২০
- সংখ্যাবাচক শব্দ
  - এক, দুই, তিন
  - দশ, বিশ, শত
  - অর্ধ, দেড়, সাড়ে
- লিখিত সংখ্যা-চিহ্ন
  - দাগ/ট্যালি
  - ব্রাহ্মী সংখ্যা
  - বাংলা অঙ্ক: ০ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯
- সাংস্কৃতিক ব্যবহার
  - পহেলা বৈশাখ
  - একুশে ফেব্রুয়ারি
  - বাইশে শ্রাবণ

বাংলা বর্ষপঞ্জির ইতিহাস

কালের কথা: অব্দ থেকে বঙ্গাব্দ পর্যন্ত

সময়কে বাঁধার চেষ্টা মানুষ করে আসছে হাজার বছর ধরে। আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র-চাঁদ-সূর্যের গতিবিধি দেখে প্রাচীন মানুষ শিখেছিল ঋতু বদলানোর হিসাব। সেই হিসাব থেকেই জন্ম নিয়েছে পঞ্জিকা বা বর্ষপঞ্জি। বিশ্বের বিভিন্ন সভ্যতা আলাদা আলাদাভাবে এই কালগণনা পদ্ধতি গড়ে তুলেছে– সুমেরীয়, রোমান ও আরবরা যেভাবে, ভারতীয়রাও ঠিক সেভাবে। বাংলার নিজস্ব বর্ষপঞ্জি– **বঙ্গাব্দ**– এই দীর্ঘ যাত্রার ফসল। এই নিবন্ধ সেই যাত্রার পুরো ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা।

MABARUN PUBLICATION

অব্দ বা বর্ষগণনার সূচনা: পৃথিবীর প্রথম পঞ্জিকা

মানুষ যখন থেকে কৃষিকাজ শুরু করে, তখন থেকেই সময়ের হিসাব রাখার প্রয়োজন দেখা দেয়। কোন মাসে বীজ বুনতে হবে, কোন মাসে ফসল কাটতে হবে– এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই তৈরি হয় পঞ্জিকা। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ প্রমাণ পেয়েছেন যে, খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম সহস্রাব্দে মেসোপটেমিয়া তথা আধুনিক ইরাকের সুমেরীয় সভ্যতায় একটি চান্দ্র-সৌর মিশ্র পঞ্জিকা ব্যবহৃত হতো।

উৎস: বাংলাপিডিয়া, উইকিপিডিয়া, Encyclopaedia Britannica, আবুল ফজলের আকবরনামা

• *পাচীন মেসোপটেমিয়ার কিউনিফম ট্যাবলেট– পথিবীর পথম পঞ্জিকা-সংক্রান্ত লেখ্যচিত্রের নমুনা (উৎস: উইকিমিডিয়া কমন্স)*

সুমেরীয়দের পর ব্যাবিলনীয়রা এই পঞ্জিকাকে আরও পরিশীলিত করে। তারা এক বছরকে ১২টি চান্দ্র মাসে ভাগ করে। প্রতি মাস ছিল ২৯ বা ৩০ দিনের। সৌরবর্ষের সঙ্গে মেলাতে তারা প্রয়োজনমতো একটি অতিরিক্ত মাস যুক্ত করত– যাকে বলা হতো আন্তঃক্ষেপী বা অধিমাস পদ্ধতি। মিশরীয়রা একটু ভিন্ন পথে গিয়েছিল– তারা সৌরবর্ষের ওপর ভিত্তি করে ৩৬৫ দিনের বর্ষপঞ্জি তৈরি করে, যা আধুনিক পঞ্জিকার পূর্বপুরুষ।

‘সভ্যতার প্রথম কাজগুলোর মধ্যে একটি ছিল সময়কে পরিমাপ করা– ফসল বোনার জন্য, উৎসবের জন্য, এবং মৃতদের স্মরণ করার জন্য।’

– Encyclopaedia Britannica, 'Calendar', Vol. ২

এই প্রাথমিক পঞ্জিকা-ব্যবস্থার মধ্যে কিছু সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য ছিল: সূর্য ও চাঁদের গতিপথ অনুসরণ, ঋতু-পরিবর্তনের নির্দেশিকা এবং ধর্মীয় উৎসব নির্ধারণ। পৃথিবীর প্রতিটি সভ্যতা নিজের ভূগোল ও প্রকৃতি অনুযায়ী এই পঞ্জিকার নিজস্ব সংস্করণ তৈরি করেছে।

খ্রিস্টাব্দ বা গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জি: বিশ্বের আন্তর্জাতিক অব্দ

আজ পৃথিবীর প্রায় সব দেশে যে ক্যালেন্ডার ব্যবহার হয়, তার নাম **গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জি**। এর জন্ম হয়েছে একটি দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে।

জুলিয়ান ক্যালেন্ডারের জন্ম (খ্রিস্টপূর্ব ৪৬ অব্দ)

রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার খ্রিস্টপূর্ব ৪৬ অব্দে সালে প্রথম একটি সুপরিকল্পিত সৌরবর্ষভিত্তিক পঞ্জিকা প্রবর্তন করেন। আলেকজান্দ্রীয় জ্যোতির্বিদ সোসিজেনেসের পরামর্শে তিনি মিশরীয় সৌর-পঞ্জিকার আদলে ৩৬৫.২৫ দিনের বছর গণনার পদ্ধতি চালু করেন। প্রতি চার বছর পর একটি অধিবর্ষ (Leap Year) যুক্ত করা হয়। এই পঞ্জিকাই জুলিয়ান ক্যালেন্ডার নামে পরিচিত হয়।

• *পোপ গেগরি XIII (১৫০২–১৫৮৫)– গেগরীয় বষপঞ্জির পবতক। ১৫৮২ সালে তিনি ‘Inter gravissimas’ পোপীয় আদেশনামা জারি করেন। (উৎস: উইকিমিডিয়া কমন্স)*

গ্রেগরীয় সংস্কার (১৫৮২ খ্রিস্টাব্দ)

জুলিয়ান পঞ্জিকার সমস্যা ছিল যে, এটি প্রকৃত সৌরবর্ষের চেয়ে প্রতি বছর প্রায় ১১ মিনিট বেশি ধরত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই পার্থক্য জমতে জমতে ষোড়শ শতাব্দীতে ১০ দিনে পরিণত হয়। এই ভ্রান্তি সংশোধনে পোপ গ্রেগরি XIII ১৫৮২ সালে ‘Inter gravissimas’ ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে সংশোধিত পঞ্জিকা জারি করেন।

পোপের নির্দেশে ১৫৮২ সালের ৪ অক্টোবরের পর সরাসরি ১৫ অক্টোবর গণনা শুরু হয়– অর্থাৎ একলাফে ১০টি দিন বাদ দেওয়া হয়। গ্রেগরীয় পঞ্জিকায় ৪০০ দ্বারা বিভাজ্য শতাব্দীর বছরই কেবল অধিবর্ষ হবে– বাকি শতাব্দীর বছর হবে না। এই সংস্কারে বার্ষিক ভ্রান্তি কমে দাঁড়ায় মাত্র ২৬ সেকেন্ডে। বিভিন্ন প্রটেস্ট্যান্ট দেশ শুরুতে এটি প্রত্যাখ্যান করলেও পরে গ্রহণ করে– ইংল্যান্ড ১৭৫২ সালে।

হিজরি অব্দ: ইসলামি চন্দ্রবর্ষ

হিজরি অব্দ হলো একটি বিশুদ্ধ চান্দ্র বর্ষপঞ্জি, যা মুসলিম বিশ্বের ধর্মীয় ক্যালেন্ডার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর সূচনা ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর (রা.)-এর শাসনামলে।

হিজরি সাল প্রবর্তনের পূর্বে আরবরা বিভিন্ন স্মরণীয় ঘটনার ওপর ভিত্তি করে দিন গণনা করতেন। হজরত উমর (রা.)-এর আমলে একটি নির্দিষ্ট তারিখের প্রয়োজন হলে চতুর্থ খলিফা হজরত আলী (রা.) সহ সাহাবীদের পরামর্শে নবি মুহাম্মদ (সা.) -এর মদিনায় হিজরতের বছর (৬২২ খ্রিস্টাব্দ) থেকে সন গণনা শুরুর সিদ্ধান্ত হয়।

– Banglapaedia, ‘হিজরি বর্ষপঞ্জি’; risingbd.com

হিজরি বছর ১২টি চান্দ্র মাসে গঠিত। চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করে প্রতিটি মাস ২৯ বা ৩০ দিনে হয়। তাই হিজরি বছর সৌরবর্ষের চেয়ে ১১–১২ দিন কম– মাত্র ৩৫৪ বা ৩৫৫ দিনের। এই কারণে হিজরি মাসগুলো প্রতি বছর সৌর ঋতুর সঙ্গে মিলিয়ে চলে না; রমজান কখনো গ্রীষ্মে, কখনো শীতে পড়ে।

মুঘল সম্রাটরা ভারতে শুরুতে হিজরি অব্দ ব্যবহার করে রাজস্ব আদায় করতেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয়– হিজরির চান্দ্রবর্ষ ও কৃষিজ সৌরবর্ষের মধ্যে পার্থক্যের কারণে ফসল তোলার আগেই কর আদায়ের সময় চলে আসত। আকবরনামায় আবুল ফজল লিখেছেন যে, কৃষকরা এই ব্যবস্থায় অত্যন্ত কষ্টে পড়তেন।

SINCE-1993
NABARUN PUBLICATION